# জীবনের উদ্দেশ্য

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

# জীবনের উদ্দেশ্য

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

GOODWORD BOOKS

প্রথম প্রকাশিত ঃ ২০২৩

অনুবাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলী:

মাহমুদ হোসেন (অনুবাদক)
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
মুস্তাফা কামাল হায়দার
সুবেদার মেজর মহিউদ্দিন মণ্ডল

Goodword Books
A-21, Sector 4, NOIDA-201301
Delhi NCR, India
Tel. +9111-41827083, Mob: +91-8588822678
email: info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

Center for Peace and Spirituality
1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013
Mob. +91-9999944119
email: info@cpsglobal.org
www.cpsglobal.org

Peace and Spirituality Forum
(Bengal Chapter of CPS International)
mwkbangla@gmail.com

Printed in India

# মানুষের ভবিতব্য

এই নভোমণ্ডলের বাইরের কোনো সত্তা একটি মহাকাশযানে চড়ে যদি পৃথিবী নামক এই গ্রহটিতে অবতরণ করে তাহলে, সে এখানে মানুষসহ নানা ধরনের জীবনের উপস্থিতি দেখে হতবাক হয়ে যাবে। কারণ, এমন অনন্য সৃষ্টিমালা সে আগে কখনও দেখেনি। এই বিশাল মহাকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নক্ষত্ররাজির মধ্যে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব আসলেই এক অসামান্য ব্যতিক্রম। মহাকাশের এই অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে নিশ্চয়ই এমন আরও অসংখ্য গ্রহের অস্তিত্ব আছে এবং পৃথিবীর মতো তারাও তাদের নিজ নিজ গ্যালাক্সিতে তাদের সূর্যের (নক্ষত্রের) চারপাশে ক্রমাগত ঘুরছে। কিন্তু আমরা জানি, ওইসব গ্রহের গ্যাসীয় ও শুষ্ক প্রস্তরময় পৃষ্ঠে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই। বস্তুতঃ আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে, কারণ এখানে জীবনধারণের উপকরণসমূহ সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

যারা পৃথিবী নামক এই গ্রহে জন্ম নিয়ে তাদের সারা জীবন কাটিয়ে দিল, তারা কিন্তু প্রকৃতির এই

বিস্ময়কর অসাধারণত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ, শৈশব থেকেই প্রতিদিন এই চেনা পৃথিবীকে দেখতে দেখতে এর নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা বুঝতেই পারে না যে, এই পৃথিবীর পরিবেশ মহাকাশের অন্য গ্রহের তুলনায় কতটা ব্যতিক্রমী। যদি তা বুঝতে পারত, তাহলে প্রতিদিন সকালে একবার করে বলে উঠত, "আহ! কী সুন্দর আর কী নিখুঁতই না আমাদের এই পৃথিবী।"

অনাদিকাল থেকেই এই পৃথিবী জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু এই ব্যাপারটি কেবল আধুনিক সময়ের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই আরও স্পষ্টভাবে জানতে পারা গেছে। ফলে, পৃথিবী যে জীবনধারণের জন্য সহায়ক তা আগের যুগের মানুষের চেয়ে আজকের যুগের মানুষরা আরও সহজেই স্বীকার করে নিয়েছে।

পৃথিবীর এই 'জীবনধারণ সহায়ক ব্যবস্থা' আসলে কী? এটা একজন 'দাতা'র পক্ষ থেকে আসা মানুষের জন্য একটি উপহার। এমতাবস্থায় মানুষের উচিত হবে তার প্রতি অনুগ্রহকারী দাতার স্বরূপ উদঘাটনে সচেষ্ট হওয়া, এবং দাতার এই দানকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর কাছে সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পণ করা।

কেন দাতা এমন অনন্য উপহারটি তাকে দিলেন সেটা ভালো করে বুঝে নেওয়ার পর তার উচিত হবে দাতার ইচ্ছা অনুসারে তার জীবন পরিচালনা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমনটি সচরাচর ঘটে না।

মানুষ এই পৃথিবীতে তার নিজের এবং সন্তানদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকে এবং একইসাথে সে নিজের জন্য একটি পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। কিন্তু তার মনে কখনোই এই চিন্তার উদয় হয় না যে, এটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা উচিত, কে এই অনন্য ব্যবস্থাটি সৃষ্টি করেছেন যা তার জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে অথবা এর স্রষ্টা মানুষের কাছ থেকে কীইবা চান! তদুপরি তার ধারণা নেই যে, এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সঠিক এবং বেঠিক— এই দুই ধরনের ব্যবহার আছে। আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি উপহার লোহার কথাই ধরা যাক। লোহা দিয়ে যেমন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়, তেমনি তা দিয়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি করা সম্ভব। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করাই হল লোহার সঠিক ব্যবহার, ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরি করা হল লোহার ভুল ব্যবহার।

একইভাবে জীবন সহায়ক ব্যবস্থাকেও দুটি আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে— একটি সঠিক এবং অন্যটি ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি এই ব্যবস্থাটিকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে, তার মধ্যে এর প্রতি সঠিক এবং কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম নেবে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি এটিকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে, তার মধ্যে সর্বতোভাবে জন্ম নেবে একটি ভ্রান্ত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, জীবন সহায়ক ব্যবস্থার জন্য দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কোনটা সঠিক আর কোনটা ভ্রান্ত তা আমরা কীভাবে নির্ণয় করব? এ ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হল, স্রষ্টার 'সৃজন-পরিকল্পনা' সম্পর্কে জানতে পারা। এই সৃজন-পরিকল্পনাই আমাদের বুঝিয়ে দেবে, জীবন সহায়ক ব্যবস্থার জন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গিটি সঠিক আর কোনটি ভ্রান্ত।

ঈশ্বর তাঁর বার্তাবাহকদের মাধ্যমে তাঁর সৃজন-পরিকল্পনাটি আমাদের জানিয়ে দিয়ে বলেছেন, তিনি, মানুষকে চিরন্তন জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন যার জীবনকাল দুটি পর্যায়ে বিভক্ত : (১) মৃত্যু-পূর্ব সংক্ষিপ্ত সময়ের জীবন, এবং (২) মৃত্যু-পরবর্তী দীর্ঘ ও অনন্ত

জীবন। মানুষের মৃত্যু-পূর্ব জীবন হল পরীক্ষার ক্ষেত্র যেখানে তার কৃতকর্মের ওপর বিচার করে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে পুরস্কার কিংবা শাস্তির বিধান দেওয়া হবে।

মানব ইতিহাসের এই গতিপথ বিচার দিবসের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে। সেদিন স্রষ্টা পৃথিবীতে মানুষের কৃতকার্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদান করার জন্য নিজেকে প্রকাশ করবেন। যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তারা চিরস্থায়ীভাবে স্বর্গে বা বেহেশতে প্রবেশ করবে। অন্যদিকে, যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে, তাদেরকে চিরস্থায়ী নরকে বা দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

জীবন এবং 'জীবন সহায়ক ব্যবস্থা' সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত তা আমরা ঈশ্বরের এই সৃজন-পরিকল্পনার আলোকেই বুঝতে পারি। এ ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হবে জীবন সহায়ক ব্যবস্থাটিকে স্রষ্টার দৃষ্টিতে দেখা। কিন্তু এটিকে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের উপায় হিসেবে দেখলে তা হবে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। প্রথম মনোভাবটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টি তাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে।

সৃজনকর্তার দৃষ্টি দিয়ে যদি আমরা সেটা দেখি, তাহলে আমরা জীবন এবং জীবন সহায়ক ব্যবস্থার দুটি ভিন্ন রূপ দেখতে পাব। সৃজনকর্তার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই জীবন সহায়ক ব্যবস্থা 'পরীক্ষা সহায়ক ব্যবস্থা' হিসেবে বিবেচিত হয়। এর বিপরীতে, যখন আমরা এটিকে মানুষের অহংবোধের দৃষ্টি দিয়ে দেখি, তখন এটি আমাদের সামনে নিছক একটি আনন্দ-উপভোগের মাধ্যম হিসেবে দেখা দেয়। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা জীবনকে একটি দায়িত্ব হিসেবে দেখি। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা জীবনকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনি; অর্থাৎ, পান, ভোজন, আনন্দ-ফূর্তি করে এক সময়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই।

বর্তমান সময়ে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলশ্রুতিতে মানুষ পূর্বের তুলনায় অতি সহজেই জীবনের অর্থবহতা এবং 'জীবন সহায়ক ব্যবস্থার' খুঁটিনাটি সম্পর্কে বুঝতে পারছে। অতএব মানুষের উচিত এই লব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও বেশি গভীরভাবে অনুধাবন করা এবং তার অনুগ্রহকে যথাযথ ব্যবহার করে অনুগ্রহকারীকে আরও গভীরভাবে স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু মানুষ তার

বিপরীতটাই করেছে। মানুষ ভুলে গেছে যে, 'জীবন সহায়ক ব্যবস্থা' আসলে 'পরীক্ষা সহায়ক ব্যবস্থা' ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সে 'জীবন সহায়ক ব্যবস্থা'কে নিছক আনন্দ-উপভোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছে, এবং জীবনকে ক্রমবর্ধমানরূপে আনন্দদায়ক করার জন্য বস্তুগত উপকরণগুলো আরও বেশি বেশি করে পাওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে।

এ বিষয়ে আমার একটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিজ্ঞতাটি অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক। ১৯৭২ সালে আমার একবার রাজস্থানের একটি স্থাপত্য কর্ম দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমার সাথে ছিলেন মুফতি মোহাম্মদ জামালউদ্দিন কাসেমিসহ আরও কয়েকজন। আমরা যে ভবনটি দেখতে গিয়েছিলাম তা ছিল একটি জনবসতিহীন টিলার উপরে অবস্থিত। আমরা একটি জীপ গাড়িতে চড়ে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে উপরে উঠছিলাম। টিলার উপরে পৌঁছানোর পর আমরা একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। সেই জনমানবশূন্য স্থানে একটি প্রশস্ত হলঘরসহ একটি বড় ভবন অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে। সেখানে মানুষের বসবাসের

কোনো চিহ্ন নেই। সম্ভবত কোনো রাজা কিংবা শাসক প্রায় দুইশত বছর আগে এটি নির্মাণ করেছিলেন। মানুষের অস্তিত্ব না থাকলেও ভবনের আশেপাশে ছিল শত শত বানর। তারা বিভিন্ন রকমের অর্থহীন শব্দ করে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছিল। সেখানে একটা বানর ছিল যাকে দেখে অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। সে একটা জায়গাতে বসেছিল কিছুক্ষণ এবং তারপরেই সে দৌড়ে গেল এবং অকারণে বিশৃঙ্খল ভাবে লাফালফি করতে থাকল। সেদিন আমরা ভবনের ভেতরে প্রবেশ না করে, ভবনটিকে বাইরে থেকে দেখেই চলে এসেছিলাম।

আমি ভাবছিলাম, ভবন 'দখলকারী' এই বানররা তো চিন্তাই করে না কে এবং কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই ভবনটি তৈরি করেছিল। তারা কেবলই লম্ফঝম্ফ করছে, নীচে নামছে এবং অর্থহীন কোলাহল করে যাচ্ছে। এই ধরনের প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে তারা এমন সব ক্রিয়াকলাপে যুক্ত ছিল যেগুলি কিছুটা অপরাধমূলক এবং সেগুলি ছিল ভবনটির সঠিক ব্যবহারের পরিপন্থী।

আমি ভাবতে লাগলাম, এত সুন্দর একটি ভবনের এমন অপব্যবহার কি চলতেই থাকবে, না, এর নির্মাতা উপস্থিত হয়ে তিনি এহেন গর্হিত আচরণের জন্য বানরদের শাস্তি প্রদান করে যাদের জন্য ভবনটি নির্মিত হয়েছিল তাদের হাতে এটি হস্তান্তর করবেন।

এই উদাহরণটি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ভবনটি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। সঠিকভাবে বলতে গেলে, যে উদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যবহার করা উচিত ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে এটি কিছু বন্য-বানরের বাসস্থানে পরিণত হয়েছিল, যারা সেখানে মুক্তভাবে বর্বর, কোলাহলপূর্ণ, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে চলেছিল।

আলোচ্য উদাহরণটি আজকের বিশ্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বর্তমানে এই পৃথিবী নামক গ্রহটি হয়ে গেছে সেই ভবনের মতো, তবে পরিসরটা কেবল বড়, এখানে ছড়িয়ে থাকা মানুষেরা চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করছে। তারা পৃথিবীকে কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্থান হিসেবে মনে করে নিয়েছে, কিন্তু এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন এবং কেন

করেছেন— এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ব্যাপারে তারা নিতান্তই উদাসীন।

কীভাবে এমনটা হল? বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান যখন 'জীবন সহায়ক ব্যবস্থা'র সব খুঁটিনাটি আমাদের সামনে হাজির করেছে এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় যেগুলি প্রচার করেছে, ঠিক একই সময়ে আর একটি ব্যাপার ঘটেছে। ব্যাপারটি হল, ইদানীং একটি নতুন সংস্কৃতি চালু হয়েছে যাকে বলা যায় 'তাৎক্ষণিক তুষ্টির সংস্কৃতি'। বিভিন্ন কারণে সারা বিশ্বে এর প্রসার ঘটছে। চারদিকের ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে এখন এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে মানুষ ধরেই নিয়েছে যে এই বিশ্বে যা কিছু আছে তা কেবল মানুষের উপভোগের জন্য।

এরকম পরিবেশের প্রভাবে পড়ে এবং যৌক্তিক চিন্তাভাবনার অনুপস্থিতিতে 'জীবন সহায়ক ব্যবস্থা' কার্যত আজ একটি 'ভোগ-সহায়ক' ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে মানবসমাজ নেমে গেছে পশুর পর্যায়ে।

মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য কী? পশু কেবল

তার নিজের স্বার্থটাই দেখে, কিন্তু মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপারে সচেতন থাকার পাশাপাশি তার দায়দায়িত্বও স্বীকার করে নেয় এবং তা পালন করে।

কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এই পার্থক্যটা অনেকটাই মুছে গেছে। পার্থক্য যতটুকু আছে তা আপাতভাবে থাকলেও বাস্তবে তেমন একটা নেই। আজ মানুষের সংস্কৃতি পশুদের সংস্কৃতির চেয়ে তেমন উন্নত কিছু নয়।

ব্যাপারটা কিন্তু অতটা সাধারণ নয়। স্পষ্টতই এটা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির নিয়ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার নামান্তর। আর প্রকৃতির নিয়ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরিণাম দ্বিগুণ ক্ষতি— একবার মৃত্যু-পূর্ব সময়কালে, আর একবার মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে। পৃথিবীতে বসবাসকালে স্বীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার করে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম থেকে বিচ্যুত হতে পারে, কিন্তু সেই কাজের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক পরিণতি থেকে নিজেকে বাঁচানোর ক্ষমতা তার নেই। আজকের মানুষের সামনে এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ।

মৃত্যু-পূর্ব ক্ষতির ব্যাপারটি মানুষ নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থাকে। নির্ধারিত এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মানুষ তার সমস্ত সময় এবং শক্তি ব্যয় করে। কিন্তু দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যে কেবল হতাশাই জোটে। এই পৃথিবীতে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই হতাশায় ভুগে ভুগে তাদের জীবন কাটিয়ে যায়। নারী কিংবা পুরুষ কেউই এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রশ্ন আসতে পারে, এই হতাশার ব্যাপারটি কেন ঘটে? এর কারণ হল, প্রত্যেক মানুষই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখে, কিন্তু সেজন্য তার যে সম্বলের প্রয়োজন তা এই পৃথিবীতে নেই। সেজন্যই অনেক চেষ্টার পরও মানুষের জীবনে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অধরাই থেকে যায়।

মানুষের বিশেষত্ব হল তার পাঁচটি ইন্দ্রিয়— দৃষ্টি, স্পর্শ, স্বাদ, ঘ্রাণ এবং শ্রবণ। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় আসলে মানুষের জন্য ভোগের মাধ্যম। সৃষ্টিকর্তা মানুষের জন্য আনন্দ ও ভোগের যে বিশাল ভাণ্ডার মজুত রেখেছেন— চোখ, ত্বক, জিভ, নাক ও কানের মাধ্যমেই তা মানুষের চেতনায় অভিঘাত সৃষ্টি করে। দর্শনেন্দ্রিয় অত্যন্ত আনন্দঘন অভিজ্ঞতা প্রদান করে,

এবং অনুরূপভাবে স্পর্শ, স্বাদ, ঘ্রাণ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় নানা অভিজ্ঞতা প্রদান করে থাকে। এই মহাবিশ্বে অন্য কোনো প্রাণী মানুষের মতো আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করার ক্ষমতা রাখে না। নিঃসন্দেহে এই ক্ষমতা মানুষের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া একটি ব্যতিক্রমী উপহার।

এ ছাড়াও মানুষের আরও একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর তা হল চিন্তা করার ক্ষমতা। চিন্তা করার এই অনন্য ক্ষমতা হল তার জন্য আনন্দ উপভোগ করার আর একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। মানুষের চিন্তাকর্ম যা কদাচিত বাহ্যিকভাবে প্রতিভাত হয়, মানুষকে এমন এক ধরনের আনন্দ-অনুভূতি দেয় যা অন্য কোনো উপায়ে উপলব্ধি করা যায় না।

এই আনন্দগুলি অনুভব করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ সেগুলো উপভোগ করার উপায় খুঁজে পায় না। প্রত্যেক মানুষই ভোগবিলাসের সীমাহীন ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়, কিন্তু এই পৃথিবীতে স্বল্প সময় বাস করার পর প্রত্যেক নরনারীই তাদের বাসনা এক প্রকার অপূর্ণ রেখেই মারা যায়। পৃথিবীতে মানুষের বাসনা

আছে, কিন্তু বাসনা পূরণের উপায় নেই— এই ঘটনা নিশ্চিতভাবে এই ইঙ্গিত দেয় যে, সৃজন পরিকল্পনায় বাসনা পূরণের উপায়গুলিকে স্থান দেওয়া হয়নি। বরং মানুষকে বাসনা দেওয়া হয়েছে যাতে সে জীবনের বাস্তবতা বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তার জীবন পরিকল্পনা রচনা করতে পারে।

একথা মনে রাখতে হবে, প্রাণীজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষই 'আগামীকাল' বা ভবিষ্যতের ধারণা অনুধাবন করতে পারে। পশুরা জীবন্ত প্রাণী কিন্তু তারা এই ধারণাটি পোষণ করতে পারে না। কিছু সংখ্যক পশু কেবল বর্তমানকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ভবিষ্যত নিয়ে ভাবে না। কিন্তু, মানুষ তার বর্তমানের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে ভবিষ্যত সম্পর্কে ধারণা করতে পারে, কিন্তু সে তার আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করতে পারবে কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না।

এই বাস্তবতার মধ্যে মানুষের জন্য একটি সূত্র বা ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে যা থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের সীমাবদ্ধতার কারণে ভবিষ্যত সম্পর্কে তার সব আকাঙ্ক্ষা এই পৃথিবীতে পূরণ হবার নয়। অতএব

মৃত্যুর পরের জীবনে তার এই কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ পেতে হলে তাকে বর্তমান পৃথিবীতেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে নিতে হবে।

বর্তমান বিশ্বকে একটি পরীক্ষা কক্ষের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। পরীক্ষা-কক্ষের ভেতরে শিক্ষার্থীর মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলো পূরণ করার ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু সেখানে তার সব ইচ্ছাপূরণের ব্যবস্থা থাকে না। অতএব যেসব শিক্ষার্থী এই পরীক্ষা-কক্ষকে কেবল একটি পরীক্ষা-কক্ষ হিসেবে বিবেচনা করবে, সে হতাশার শিকার হবে না। অন্যদিকে, যেসব শিক্ষার্থী এই পরীক্ষা-কক্ষকে তার বাসনা পূরণের স্থান হিসেবে বিবেচনা করবে, তার ভাগ্যে কেবল হতাশাই জুটবে!

স্রষ্টার সৃজন-পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবী মানুষের জন্য পরীক্ষা-কক্ষ। এখানে মানুষকে যে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে তার অপরিহার্য উপাদানগুলি 'জীবন সহায়ক ব্যবস্থা' সরবরাহ করে। যারা এই পৃথিবীকে নিছক পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করে এবং সেই অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করে, তারা হতাশার শিকার হবে না। কিন্তু যারা এই

পৃথিবীকে তাদের বাসনা পরিতৃপ্তির উপায় হিসাবে গণ্য করে, তারা চরমভাবে হতাশা ও ব্যর্থতার শিকার হবে। কারণ সৃজন পরিকল্পনার নকশায় পৃথিবীকে বাসনা পূরণের স্থান হিসেবে প্রস্তুত করা হয়নি।

এই নশ্বর পৃথিবীতে যে ব্যক্তি পরীক্ষার ব্যাপারটি মাথায় রাখে আর যে ব্যক্তির কাছে যে-কোনো মূল্যে ভোগবিলাসই গুরুত্বপূর্ণ, দুজনের জীবনধারার মধ্যে থাকবে বিস্তর পার্থক্য। এই বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে উভয় ধরনের জীবনধারার কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হল।

এ ক্ষেত্রে মূল পার্থক্যটি হল, বিষয়টি নিয়ে কীভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। এই পৃথিবীকে পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করলে আমাদের মনে স্রষ্টা-কেন্দ্রীক ধারণা বা চিন্তার বিকাশ ঘটে। এই ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তি নিজেই খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে, স্রষ্টার সৃজন-পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে তার কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়। অন্যদিকে, যার জীবনের ধারণা ভোগবিলাসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, সে অনিবার্যভাবেই আত্মকেন্দ্রীক চিন্তায় লিপ্ত থাকে।

সে ধরেই নেয় যে, অন্য কোনো উচ্চতর সত্তা নয়, বরং তাকে কেবল তার নিজের ইচ্ছা দ্বারাই চালিত হলেই চলবে।

যে ব্যক্তি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে যে পৃথিবী একটি পরীক্ষার স্থান, সে তার ইহলৌকিক জীবনে এমন ধরনের কার্যকলাপে মনোনিবেশ করবে যা তাকে পারলৌকিক জীবনে পুরস্কার এনে দেবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে পৃথিবী কেবল একটি আমোদপ্রমোদের জায়গা, সে তো শুধু তার পার্থিব জীবনে উন্নতি করার কাজেই লিপ্ত থাকবে। অতএব বলা যায়, পরীক্ষা-কেন্দ্রীক চিন্তাধারা মানুষকে তার মৌলিক চাহিদা মেটানোর মধ্যেই তুষ্ট রাখবে। অন্যদিকে, ভোগ-কেন্দ্রীক চিন্তাধারা সর্বদাই তাকে আরও বেশি বেশি সম্পদ আহরণের দিকে চালিত করবে। মানুষ সাধারণভাবেই লোভের বশবর্তী; তার লোভের সীমা নেই। পরীক্ষা-কেন্দ্রীক চিন্তাধারার একজন ব্যক্তির যদি একটি ছোট গাড়ি থাকে এবং তার বন্ধুরা তাকে একটি বড় গাড়ি কিনতে বলে, তখন সে বলবে : "আমি আমার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রকে আরও কঠিন করতে চাই না।" এর বিপরীতে একজন

ভোগ-কেন্দ্রীক ব্যক্তির বড় গাড়ি থাকলেও সে আরও বড় কিংবা আরও বেশি সংখ্যক গাড়ি কেনার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

একজন পরীক্ষা-কেন্দ্রীক চিন্তাধারাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেকে নিরর্থক বিনোদন থেকে দূরে রাখবে, কারণ এগুলিকে সে বিভ্রান্তি বলে মনে করে। অন্যদিকে, একজন আমোদ-প্রমোদ-প্রত্যাশী ব্যক্তি বিনোদনের প্রলোভনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাতে তার যত সময় এবং অর্থের অপচয়ই হোক না কেন। পরীক্ষা-কেন্দ্রীক চিন্তাধারার ব্যক্তি অর্থ, সময়, খাদ্য ইত্যাদির অপচয় করবে না এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এড়িয়ে চলবে। এর বিপরীতে অপব্যয়ই ভোগবাদী ব্যক্তির জীবনযাপনের মূল অনুসঙ্গ। পরীক্ষা-কেন্দ্রীক চিন্তাধারার ব্যক্তি নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, কিন্তু ভোগবাদী ব্যক্তির নিকট নৈতিক মূল্যবোধ নয়, বরং ব্যক্তি স্বার্থই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

স্রষ্টার সৃজন-পরিকল্পনার অনুসারে, এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল— বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব লালন করে— ঈশ্বর-কেন্দ্রীক ব্যক্তিত্ব নাকি আত্ম-কেন্দ্রীক

ব্যক্তিত্ব? পৃথিবীতে মানুষের দৈহিক প্রয়োজনে যেমন ক্রমাগত খাবারের জোগান দিতে হয়, তেমনি তার আত্মিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যও ক্রমাগত আত্মিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আত্মিক খাদ্যই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরমুখী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়।

এই আত্মিক খাদ্য আসলে কী? এটা হল মানুষের দ্বারা স্বীকৃত সত্য— সেই সত্য নিজস্ব বা বহিস্থ যে কোনো মানুষের নিকট হতে তার নিকটে আসুক না কেন। অর্থাৎ তার চিন্তাভাবনা কোনোভাবে প্রভাবিত হবে না; চলতি পরিস্থিতির প্রভাব মুক্ত হয়ে সে তার অভিমত গঠন করবে। অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকৃতির পরিবর্তে, তার জীবন হবে কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতির জীবন। চরম নেতিবাচক পরিস্থিতিতেও সে সবকিছুকে দেখবে ইতিবাচকভাবে। সে তার স্বাধীনতাকে ব্যবহার করবে স্বরোপিত শৃঙ্খলা মেনে চলার মধ্য দিয়ে এবং সে সর্বাবস্থায় ন্যায়পরায়ণতাকে রাখবে সমুন্নত, এমনকি তা যদি তার নিজের স্বার্থের পরিপন্থীও হয়। জাগতিক সাময়িক মুনাফার চেয়ে আখেরাতের (পরকালীন জীবনের) চিরন্তন পুরস্কার প্রাপ্তিই হবে তার মূল লক্ষ্য।

যারা বর্তমান দুনিয়াকে পরীক্ষার ক্ষেত্র মনে করে এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে পরকালে তারা তাদের স্রষ্টার সান্নিধ্যে অনন্ত উদ্যানে (অর্থাৎ বেহেশতে) অবস্থান করবে। অন্যদিকে, যারা এই পৃথিবীকে নিছক ভোগবিলাসের জায়গা বলে মনে করে তারা পরিণামে চিরন্তন জগতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হবে, এবং তাদের জন্য থাকবে কেবল বঞ্চনা ও হতাশা।

# জীবনের উদ্দেশ্য

বছর দুয়েক আগের কথা। তারিখটা ২০০৬ সালের ১১ই মার্চ। আমি হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লি ফেরার একটি সান্ধ্যকালীন বিমানে ছিলাম। আমার সাথে তখন সিপিএস ('সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালটি') দলের বেশ কয়েকজন সদস্যও ছিলেন। তাঁরা যাত্রীদের সাথে কথা বলছিলেন এবং তাদের মাঝে 'দাওয়াহ'-সংক্রান্ত প্রচারপত্র বিলি করছিলেন। যাত্রীদের মাঝে ছিলেন নেহা বাটওয়ারা নামের একজন ভদ্রমহিলা। সেই সময় বিমানের ভেতরে ওই ভদ্রমহিলার সাথে

আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনো কথা হয়নি। বিমান দিল্লিতে অবতরণের পর তিনি তাঁর নিজ শহর আলওয়ারে চলে যান। কিন্তু মাত্র দুই সপ্তাহ পরে, ২৪শে মার্চ, আমি তাঁর কাছ থেকেই মেইলের মাধ্যমে নীচের চিঠিটি পাই :

শ্রদ্ধেয় মওলানা ওয়াহিদউদ্দিন খান,

আমি নেহা, একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করছি। স্নাতক শেষ করার পরেই একটি শীর্ষ বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার চেয়ে ভালো আর কী-ই বা হতে পারে! তবুও, বিশ্বাস করুন, আমি আরও উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। সেজন্যেই আপনাকে চিঠি লিখছি। দিল্লিগামী একটি বিমানে (সিপিএস সদস্য) খালিদ আনসারি এবং সাদিয়া খানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আপনার দিক নির্দেশনা ('গাইডেন্স') তাদের জীবনে যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তা আমি খুব ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছি।

মওলানা সাহেব, আমি জানি ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের সবাইকেই এই পৃথিবীতে একটি

উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে, যা করতে পারলে তা হবে মৃত্যুর পরে স্বর্গ পাওয়ার চেয়েও বেশি তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু যে বিষয়টি আমি জানি না তা হল, আমাকে কোন উদ্দেশ্যে এখানে পাঠানো হয়েছে। আপনি যদি আমাকে এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারেন তবে আমি সারাজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি বর্তমানে হায়দ্রাবাদে বাস করছি।

সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা,

নেহা বাটওয়ারা, সফটওয়্যার প্রকৌশলী,এমআইইএল হায়দ্রাবাদ

এই চিঠিটি কেবল কোনো একজন ব্যক্তির চিঠি নয়। বরং এটি যেন প্রতিটি সত্তার কণ্ঠস্বর, প্রতিটি নরনারীর আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। প্রত্যেক ব্যক্তি একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের সন্ধান করছে। এটা তার স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু মানুষ তার মৃত্যুর আগেই জীবনের বর্তমান পর্যায়ে এই উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের দর্শনলাভ করতে চায়। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই, এবং সে অপেক্ষা করতেও প্রস্তুত না।

এখানে মূল প্রশ্নটি হল : মানুষ কোথায় তার এই উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন অর্জন করতে চায়? নিজের তৈরি জগতে, নাকি ঈশ্বরের তৈরি জগতে? অবশ্যই তা ঈশ্বরের তৈরি জগতে, কারণ নিজের তৈরি জগতের স্থায়িত্ব নেই।

এই অবস্থায় মানুষকে প্রথমেই জানতে হবে, ঈশ্বরের তৈরি এই জগতটি কোন আইন বা পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার সময় স্রষ্টার মনের মধ্যে কী পরিকল্পনা ছিল। কারণ এই বিষয়গুলো না জানলে সে কখনোই তার ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না।

আপনি যদি রাস্তায় গাড়ি চালাতে চান, তাহলে প্রথমেই আপনাকে সংশ্লিষ্ট দেশের ট্রাফিক আইনগুলো জানতে হবে; যেমন রাস্তায় বামদিক না কি ডানদিক দিয়ে চলতে হয়। কোনো দেশে হয়তো ডানদিক দিয়ে গাড়ি চালানোর নিয়ম; আপনি সেখানে বামদিক দিয়ে গাড়ি চালালে নিশ্চিত দুর্ঘটনার কবলে পড়বেন।

মানব জীবনের বিস্তীর্ণ যাত্রাপথে এই কথা সত্য। মানুষের জীবনের যাত্রা মহাকাশে বা তার নিজের

তৈরি কোনো জগতে শুরু হয় না, তা হয় ঈশ্বরের তৈরি জগতে। সেইজন্য সকল নরনারীর জন্য ঈশ্বরের সৃজন-পরিকল্পনা বুঝতে পারা এবং সে-অনুযায়ী তাদের জীবন গঠন করা অপরিহার্য। আর এই জীবন পরিকল্পনা না থাকলে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রকৃতি মানুষকে জীবনধারণ ও তার যথাযথ উন্নতির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে— এটা ঈশ্বরেরই পরিকল্পনার অংশ। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ তৃষ্ণার্ত হলে জল পান করে তার তৃষ্ণা মেটায়। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় প্রকৃতির দেওয়া জলই সেই মুহূর্তে তার চাহিদা সবচেয়ে ভাল করে মেটাতে পারে। একইভাবে, ক্ষুধার্ত মানুষ প্রকৃতির দেওয়া খাবার খেয়েই তার ক্ষুধা নিবারণ করে। আবার মানুষের শ্বাস নেওয়ার জন্য দরকার প্রকৃতি প্রদত্ত অক্সিজেন। অক্সিজেন ছাড়া কেউ কয়েক সেকেন্ডের জন্যও বাঁচতে পারে না। প্রকৃতি মানুষকে এতসব কিছু দেওয়ার কারণ হল ঈশ্বর এইভাবেই পরিকল্পনা করেছেন।

অতএব, জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে হলে আমাদের ঈশ্বরের সৃজন-পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে হবে; এ ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই।

প্রকৃতির গ্রন্থ 'কুরআন' থেকেও আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাই। পবিত্র কুরআনের ১০৩ নাম্বার সুরায় [সুরা আল-আসর] বর্ণিত আছে, ইতিহাস সাক্ষী যে 'মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে', কিন্তু তারা নয় যারা স্রষ্টার দ্বারা নির্ধারিত জীবনধারা অনুসরণ করে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে মানুষের জীবন দুটি পর্যায়ে বিভক্ত— মৃত্যু-পূর্ববর্তী পর্যায় এবং মৃত্যু-পরবর্তী পর্যায়। মৃত্যুর পূর্বের পর্যায়টি কর্মসম্পাদনের জন্য, আর মৃত্যুর পরের পর্যায়টি কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ করার জন্য। মৃত্যুর পরে আমাদের যা পাওয়ার কথা, তা তো আমরা মৃত্যুর আগে পেতে পারি না। আবার মৃত্যুর আগে আমাদের যা করা প্রয়োজন, মৃত্যুর পরে তা করার কোনো সুযোগ থাকবে না।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতিটি মানুষ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই আকাঙ্ক্ষাগুলি তার কাছে খুবই মূল্যবান। কিন্তু এটাও সত্য যে, মানব ইতিহাসে দেখা যায় কেউই এই আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণে পুরোপুরি

সফল হয়নি। অনেক মানুষ তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণের জন্য সারা জীবন ব্যয় করে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না।

বাহ্যত তারা জীবনে অত্যন্ত সফল হলেও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়ে তারা প্রত্যেকে চরম আফসোস ও দুঃখ নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। পৃথিবীতে সে যা চেয়েছিল তা অর্জন করতে পারেনি।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, এই পৃথিবীতে সব কিছুরই জুটি রয়েছে। এখানে সমস্ত কিছু নিজের জুটির সাথে একত্রিত হয়ে পূর্ণতা পায়। এই ব্যাপারটি সর্বজনীন। ভূমণ্ডল থেকে নভোমণ্ডল সব ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারটি সমভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন, একটি ঋণাত্মক কণার সাথে জোড়া হিসেবে একটি ধনাত্মক কণা থাকে। মানবজাতি নারী ও পুরুষ উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। প্রাণীজগতেও পুরুষ এবং মহিলা রয়েছে। এমনকি উদ্ভিদ জগতেও পুরুষ এবং মহিলা রয়েছে। অর্থাৎ, সর্বজনীনভাবে সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই জোড়ার ব্যাপারটি দেখতে পাওয়া যায়। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি নারী-পুরুষ এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। কিন্তু কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাওয়ার আগেই সে

তার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হতাশ হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। এই সুবিশাল ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটিই ব্যতিক্রম আছে, এবং তা হল মানুষের আকাঙ্ক্ষা। প্রত্যেক মানুষই সুগভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সকলেই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মৃত্যুবরণ করে। পৃথিবীতে আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তার জুটি 'আকাঙ্ক্ষা পূরণ' এখানে নেই।

আমেরিকান ধর্মপ্রচারক বিলি গ্রাহাম লিখেছেন যে, তিনি একবার একজন বয়স্ক আমেরিকান ধনকুবেরদের কাছ থেকে একটি জরুরি বার্তা পান। বিলি গ্রাহাম তার সকল কর্মসূচি বাতিল করে সেই কোটিপতি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেখানে পৌঁছানোর পরে তাকে বৈঠকখানায় বসতে দেওয়া হল। বিলি গ্রাহামকে সেই কোটিপতি কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই বললেন, "দেখুন আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ। জীবনের প্রতি আমি বিতৃষ্ণ। আমার সামনে এগিয়ে যাওয়ার সব পথই অজানা। ওহে যুবক, তুমি কি আমাকে কোনো আশার আলো দেখাতে পারবে?" বিলি গ্রাহামের কাছে তার প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক

জবাব ছিল না। বঞ্চনার এই অনুভূতিকে সাথে নিয়েই এই আমেরিকান ধনকুবের পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। সম্প্রতি বিলি গ্রাহাম নিজেই একটি গুরুতর দুর্ঘটনার স্বীকার হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী আছেন, আর চূড়ান্ত গন্তব্যে যাওয়ার দিন গুনছেন।

এই পৃথিবীর প্রতিটি নরনারীর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। প্রত্যেকেই তার জীবনের উদ্দেশ্য জানতে চায়। প্রত্যেকেই সুখশান্তিতে ভরপুর একটি জীবন খুঁজে বেড়ায়। প্রত্যেকেই জীবনে পরিপূর্ণতা চায়, কিন্তু তার জীবন শেষ হয় ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি, সবমানুষই বস্তুগত জিনিসগুলো সত্যিকারের বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে করে। আর তারা এই বস্তুগত জিনিস পাওয়ার মধ্য দিয়ে জীবনের পরিপূর্ণতা খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু কেউই জীবনে এই কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি।

আসল সমস্যা হল, মানুষ হিসেবে আমরা একই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি করতে থাকি। কিন্তু এখন এই পুরো বিষয়টিই আমাদের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। প্রথমেই আমাদের গুরুত্বের সাথে স্বীকার করে নিতে

হবে যে, দুনিয়ার এই বস্তুগত জিনিসগুলো আমাদের জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে পারে না। তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে পরিপূর্ণতা পাব? মানুষের আকাঙ্ক্ষা যখন আছে, তখন আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে এটা বাস্তব, এটা যখন বাস্তব তখন অবশ্যই মহাবিশ্বের কোথাও না কোথাও এর পরিতৃপ্তির উৎস আছে।

আমরা একটি ভ্রমণের উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব। কেউ যখন ট্রেনে কিংবা বিমানে ভ্রমণ করে, তখন তার যাত্রার দুটি পর্যায় থাকে। একটি পর্যায় হল তার যাত্রাপথ এবং অন্যটি হল তার গন্তব্য। যাত্রা সফল করার জন্য যাত্রীকে অবশ্যই এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্যটি বুঝতে হবে। যে যাত্রী তা বুঝতে ব্যর্থ হবে সে অকারণেই মানসিক চাপের মধ্যে পড়বে এবং পরিণামে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে।

সেই যাত্রী প্রজ্ঞাবান যে যাত্রাকে কেবল যাত্রা হিসেবে নেয়, যাত্রাকে তার গন্তব্যস্থল বলে মনে করে না। সে জানে, গন্তব্যের সুযোগসুবিধা ভ্রমণের সময়ে পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক যাত্রী এটা সহ্য করে কারণ সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, তার যাত্রার কালটি অস্থায়ী।

এক সময়ে যাত্রা শেষ হবে এবং সে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে যাবে; এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর সে যা চেয়েছিল তা খুঁজে পাবে; ভ্রমণের সময়ে সে সেটা খুঁজে পায়নি।

বর্তমান জীবনে আমাদের অস্তিত্ব খুব অল্প সময়ের জন্য। সময়ের এই স্পন্দতা প্রমাণ করে যে আমরা ভ্রমণরত অবস্থার মধ্যে আছি। এটা হল গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর আগের সময়কাল। সেই জন্য আমাদের বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালে আমরা যা পেতে চাই তার সবগুলো পাওয়া সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে একসময়ে ওই সমস্ত কিছু পেয়ে যাব, কিন্তু আমাদের যাত্রার অন্তর্বর্তী পর্যায়ে যেগুলি পাওয়া যাবে না।

আমরা জানি, আমাদের জীবন দুটি পর্যায়ে বিভক্ত, মৃত্যু-পূর্ব পর্যায় এবং মৃত্যু-পরবর্তী পর্যায়। মৃত্যু-পূর্ব পর্যায় হল যাত্রা, আর মৃত্যু-পরবর্তী পর্যায় হল গন্তব্যে পৌঁছানো। এই বাস্তব সত্যটা সকলের জানা উচিত। এই সত্যই মানুষের জীবনকে আরও অর্থবহ করে তোলে এবং প্রত্যেক নারী-পুরুষকে এমন এক উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় যা তার জীবনকে পরিপূর্ণ অর্থে অর্থবহ এবং পরিপূর্ণতার উৎসে পরিণত

করতে পারে। জীবনের এই ব্যাখ্যাটি মানুষের মৃত্যু-পরবর্তী পুনর্জন্মের সঙ্গে যুক্ত। মৃত্যু-পূর্ব সময়ে আমরা যে-ধরনের জীবন লাভ করেছি, মৃত্যু-পরবর্তী সময়েও কি সেই ধরনের জীবন আছে? এই প্রশ্নের উত্তর হল, 'হ্যাঁ'। এটা বোঝা উচিত অন্যান্য বিষয় জানার জন্য আমরা যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করি, সেই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা জানার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী? আমরা যা জানতে চাই, তা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানীগণ অবগত থাকে— ব্যাপারটি এমন নয়। যদি তাই হতো, বাস্তবতা বিজ্ঞানীদের নিকট সুদূর পরাহত থাকত। জ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হতো। মানুষ বাস্তবতা খুঁজতে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকত। কারণ দূর থেকে দেখা পাহাড়ের মতো কোনো বাস্তবতাই আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ধরা দেয় না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আসলে যা ঘটে তা হল, গবেষণার সময় একজন বিজ্ঞানী কোনো একটি ('ক্লু') ইঙ্গিত বা সূত্র খুঁজে বের করেন। তারপর তিনি ওই বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে এমন একটি সত্যের মুখোমুখি হন

যে সম্পর্কে পূর্বে তার কোনো ধারণাই ছিল না। এই পৃথিবীতে প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনেই এমন একটি করে সূত্র খুঁজে পাওয়ার ব্যাপার নিহিত থাকে। আর এই সূত্রই বিশ্বের সব আবিষ্কারের মূল চাবিকাঠি।

উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে যে, তেরো বিলিয়ন বছর আগে 'বিগ ব্যাং' সংঘটিত হয়েছে, পৃথিবীতে জৈবিক বিবর্তন ঘটেছে, এবং আমাদের মহাবিশ্ব ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে এমন আরও অনেক কিছু।

এইসব ঘটনা যা আজকের দিনে প্রতিষ্ঠিত সত্য, মানুষ আগে তা জানত না। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে কিছু কিছু নিদর্শন মানুষের নজরে আসে। অতঃপর সেগুলো অধ্যয়ন করে মানুষ তার জ্ঞানকে প্রসারিত করেছে এবং আরও বড় বড় আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে গেছে। সেইসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এখন সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে, যদিও শুরুতে আবিষ্কারের ব্যাপারটা কেবল একটি (ক্লু) ইঙ্গিত বা সূত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সেই জীবন সম্পর্কেও আমদের নিকটে ক্লু

বা ইঙ্গিত রয়েছে। এই ইঙ্গিতগুলোকে নিয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করলে দৃঢ়ভাবে আমাদের মনে এই বিশ্বাস আসবে যে, মৃত্যুর পরেও আমাদের আর একটি জীবন রয়েছে। মৃত্যু-পরবর্তী যে জীবন রয়েছে তা সত্য আর আমাদের প্রত্যেককেই সেই জীবনের মুখোমুখি হতে হবে।

মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ইঙ্গিতের ব্যাপারটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা যাক। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য যে, মানবদেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি যা ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। আবার আমরা যে খাবার খাই তা আমাদের পরিপাকতন্ত্র কোষে রূপান্তরিত করে। এ ক্ষেত্রে আমাদের পরিপাক তন্ত্রকে কোষ গঠনের একটি কারখানার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে, প্রায় প্রতি দশ বছর অন্তর আমাদের সমস্ত শরীরের কোষগুলো প্রতিস্থাপিত হয়। নতুন নতুন কোষ দিয়ে আমাদের শরীর নতুন করে গঠিত হয়।

এই পদ্ধতিতে আমাদের শরীর বারবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তবুও আমরা দেখতে পাই, মানুষের প্রাণ বা চেতনা ঠিকই অটুট থাকে, তা

মরে না। বস্তুত মানুষের মনের অস্তিত্বই তার আসল অস্তিত্ব। বারবার শারীরিক মৃত্যু সত্ত্বেও মনের এই অস্তিত্ব অবিকৃতভাবে বেঁচে থাকে। এ থেকে আমরা যে ইঙ্গিত পাই তা হল, মানুষ উৎসগতভাবেই ঈশ্বরের একটি শাশ্বত সৃষ্টি। এই শাশ্বত অস্তিত্বের একটি অংশ থাকে মৃত্যু-পূর্ববর্তী জীবনে, আর এর বড় অংশটি থাকে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে।

এবিষয়ে আর একটি ইঙ্গিত হল, মানুষের মধ্যে রয়েছে ন্যায়বিচারের ধারণা, যা সত্যিই ব্যতিক্রমধর্মী। মানুষ তার স্বভাবগত কারণেই এই পৃথিবীতে ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা চায়। সে চায় সৎকর্মশীলরা তাদের ভালো কাজের জন্য পুরস্কার পাক, আর দুষ্কর্মকারীরা তাদের মন্দ কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করুক। নানা রকমের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষের জীবনের মৃত্যু-পূর্ব সময়ে একটি 'আদর্শ' জগত সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত পৃথিবীর নিখুঁত রূপটি মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে অর্জন করতে পারবে।

একইভাবে, আরও একটি ইঙ্গিত হল, মানুষ এমন

একটি প্রাণী যে 'আগামীকাল' (ভবিষ্যত) সম্পর্কে ধারণা করতে সক্ষম। অন্য কোনো প্রাণী ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভাবতে পারে না। এই ব্যাপারটি নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারব যে, বর্তমান পৃথিবীর সীমিত সময়ে মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত জগতকে খুঁজে না পেলেও তার জন্য মৃত্যু-পরবর্তী সীমাহীন ভবিষ্যত তো রয়েছেই। আর সেই 'আদর্শ' জগতেই মানুষ তার ঈপ্সিত পূর্ণতা লাভ করবে।

মৃত্যু-পরবর্তী 'আদর্শ' জগতের অস্তিত্বের বিষয়টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত সত্যের মতোই একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। ভবিষ্যতের সেই আদর্শ জগতে স্থান পাওয়াটা কিন্তু এমনি এমনিই হবে না। সেখানে কেবল সেইসব নরনারীই স্থান পাবে যারা মৃত্যুর আগে পৃথিবীতে তাদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পেরেছে।

যারা যোগ্য কেবল তাদেরকেই পুরস্কার দেওয়া হয়, আর যারা অযোগ্য তারা কখনোই কোনো ধরনের পুরস্কার পেতে পারে না— এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম।

এখন প্রশ্ন হল : এই 'আদর্শ' জগতের জন্য যোগ্য হওয়ার উপায় কী? উপায় একটাই, আর সেটা হল আত্মার পরিশুদ্ধি।

যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের এই আদর্শ জগতে স্থান পেতে চায় তাকে এই পৃথিবীতে প্রমাণ করতে হবে যে, এই দৃশ্যমান জগতে বাস করার সময় তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সে অদৃশ্য জগতকে দেখেছে; বিভ্রান্তির বেড়াজালের মধ্যে থেকেও সে সত্যকে আবিষ্কার করেছে; নেতিবাচক অবস্থার মধ্যেও সে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করেছে; বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সে নিজেকে পশুর স্তর থেকে উপরে স্থাপন করেছে এবং নিজেকে মানবতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেছে; সে নিজেকে অকৃতজ্ঞতা, অসততা, স্বার্থপরতা, অহংবোধ ইত্যাদির কলুষতা থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে; সে সমস্ত হৃদয় এবং মন দিয়ে বেহেশত বা স্বর্গ লাভের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এক কথায় বলতে গেলে, সে সর্বান্তকরণে ঈশ্বর-কেন্দ্রীক জীবনকে বেছে নিয়েছে।

এমন গুণসম্পন্ন নারীপুরুষ মানবতার জন্য রত্নবিশেষ। এরাই হবে ভবিষ্যতের 'আদর্শ' জগতের বাসিন্দা। কিন্তু যারা ঈশ্বর-কেন্দ্রীক জীবনের এই মানদণ্ড পূরণ করতে পারবে না, তারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে সর্বজনীন আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে তারা

চিরকালের জন্য অনুতপ্ত এবং নিন্দিত জীবনযাপন করবে। আক্ষেপ ও অপমানের ওই জীবন থেকে তারা কখনোই মুক্তি পাবে না।

## বেহেশত এবং মানুষ

অধ্যাপক নাউ নিহাল সিং আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ভারতে ফিরে আসার পর, ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। রাজ্যসভায় তাঁর মেয়াদের শেষের দিকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে তাঁর সাথে দেখা করার আমার একবার সুযোগ হয়েছিল। আমি দেখতে পেলাম, তাঁর গোটা বাড়িটা একটি বিশাল আকারের লাইব্রেরির মতো। তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

আমাদের আলাপচারিতার এক পর্যায়ে জানতে পারলাম, তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছেন। পরে তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর ডক্টরেট সম্পন্ন করেন। একদিন এই বিষয়ে একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদের জন্য একটি বিজ্ঞাপন তাঁর চোখে পড়ে। প্রফেসর সিং ওই পদের জন্য

আবেদন করলে প্রায় সাথে সাথেই 'ইন্টারভিউ'-এর জন্য ডাক পান।

ইন্টারভিউয়ের জন্য আমেরিকায় পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একজন গাইড তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছেন। সেই গাইড ভদ্রলোক অধ্যাপক সিংকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়ে গেলেন এবং সেখানকার গেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করেন। এরপর থেকে প্রতিদিনই সেই গাইড এসে প্রফেসর সিংকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ক্যাম্পাসটি ঘুরিয়ে দেখাতেন। তিনি তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তথা— পাঠাগার, খাবারের কক্ষ, শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষকদের ক্লাব, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মীদের সভায় নিয়ে গিয়ে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

এভাবে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। অধ্যাপক সিং কিছুটা উদ্বিগ্ন হতে শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে বললেন, "আমাকে তো একটি ইন্টারভিউয়ের জন্য এখানে ডাকা হয়েছিল। এখানে আমি পুরো এক সপ্তাহ ধরে আছি। অথচ

এখনও পর্যন্ত আমার কোনো ইন্টারভিউই নেওয়া হল না।" চেয়ারম্যান উত্তর দিলেন, "আপনার ইন্টারভিউ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে এবং আমরা আপনাকে বাছাই ('সিলেক্ট') করে ফেলেছি। এখন আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে যোগ দিতে পারেন।" তারপর চেয়ারম্যান অধ্যাপক সিংকে বললেন যে, তিনি বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর যার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং যিনি তাঁর গাইড হিসাবে কাজ করেছিলেন, তিনি আসলে একজন প্রবীণ অধ্যাপক এবং ওই অধ্যাপকই তাঁর ইন্টারভিউ নিয়েছেন। তিনি (চেয়ারম্যান) আরও বললেন যে, অধ্যাপক সিং-এর পাঠানো কাগজপত্র ও তথ্যাদি থেকে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁরা জানতে পেরেছেন এবং এখন তারা কেবল জানতে চেয়েছেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাথে খাপ খাওয়াতে পারছেন কি না। এই দায়িত্বটি পালন করেছেন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সেই প্রবীণ অধ্যাপক, যিনি তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে নিয়ে গিয়ে সেখানকার চলমান সব কার্যক্রমের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর

মতো ওই সময়ে ছাত্র ও শিক্ষকরা অধ্যাপক সিং-এর আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। অধ্যাপক সিং-এর ব্যাপারে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মূল্যায়ন ছিল সম্পূর্ণ ইতিবাচক। অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্র এবং কর্মী, যাদের সাথে তাঁর সপ্তাহব্যাপী থাকার সময় দেখা হয়েছিল, তাদের মূল্যায়নও ছিল একইরকম ইতিবাচক। এসব প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই তাঁরা তাঁকে বাছাই করেছেন।

এই ঘটনাটি স্বর্গ ও সেখানকার জন্য উপযুক্ত মানুষ বাছাই করার সাথে তুলনীয়। ঈশ্বর এক বিশাল এবং সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ নিখুঁত একটি বেহেশত বা স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন, সেখানে সবকিছুই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মানের। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা হল সেখানে এমন সব মানুষ বসবাস করবে যাদের চরিত্র হবে নিখুঁত এবং সেই আদর্শ পরিবেশে বাস করার জন্য সম্পূর্ণরূপে যোগ্য।

ঈশ্বর পৃথিবী নামক বর্তমান এই গ্রহকে সেই (পরবর্তী) জগতের একটি মডেল হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। স্বর্গে যা কিছু পাওয়া যাবে তার সবই এখানে বিদ্যমান, তবে একমাত্র পার্থক্য হল স্বর্গ

নিখুঁত, কিন্তু বর্তমান পৃথিবী ত্রুটিযুক্ত। স্বর্গ হল একটি আদর্শ স্থান, অথচ বর্তমান পৃথিবী আদর্শ স্থান হওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থিত। স্বর্গ চিরন্তন, কিন্তু বর্তমান পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। স্বর্গ সকল প্রকার ভয় ও কষ্ট থেকে মুক্ত, অথচ বর্তমান পৃথিবী ওই সকল ব্যাধিতে সমাচ্ছন্ন। স্বর্গ হল প্রতিদান গ্রহণের স্থান, আর বর্তমান পৃথিবী হল পরীক্ষার ক্ষেত্র।

ঈশ্বর এই পরিকল্পনা অনুসারে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং বর্তমান পৃথিবীকে তাদের বসতি করেছেন। ঈশ্বর মানুষকে কোনো প্রকার বাধা ছাড়াই স্বাধীনভাবে এখানে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন। এখানে মানুষ তার স্বাধীনতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার, অথবা তার ইচ্ছে মতো অপব্যবহার করার অধিকার ভোগ করে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তির সাথে সার্বক্ষণিক থাকার জন্য ঈশ্বর দুজন করে অদৃশ্য দেবদূত নিযুক্ত করেছেন; তারা প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সব কথা ও কাজের নথি সংরক্ষণ করে চলেছে। এই সংরক্ষিত নথির ওপর ভিত্তি করেই তাকে প্রতিদান হিসেবে পরের জগতে স্বর্গ অথবা নরক প্রদান করা হবে।

স্বর্গে মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে বসবাস করবে। কিন্তু সেখানে সে মানসিকভাবে এতটাই পরিণত ও বিবেকবান হবে যে কোনো অবস্থাতেই সে তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করা সত্ত্বেও সে যতটা সম্ভব শৃঙ্খলার সাথে জীবনযাপন করবে। এরকম মানুষদের বেছে বের করার জন্যই পৃথিবী নামক এই গ্রহকে তৈরি করা হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বর্গের সবকিছুই এই পৃথিবীতেও বিদ্যমান। এখন দেখতে হবে, কোন ব্যক্তি ভালো অথবা মন্দ সব ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও স্বর্গের জন্য যোগ্য চরিত্রের অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করে। যে ব্যক্তি নিজেকে সেভাবে প্রমাণ করতে পারবে, তাকেই স্বর্গের শাশ্বত জগতে স্থান দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হবে।

এই বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়াটিই মানুষের জন্য পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই তার ভবিষ্যত (পরকালের অবস্থান) নির্ধারিত হবে। পরীক্ষায় দেখা হবে, সে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের মহিমাকে স্বীকার করেছিল কি না; অর্থাৎ, সে নিজের বিবেকের আহবানে সাড়া দিয়েছিল কি না। সে

কি যুক্তি এবং সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, না কি তার বিরোধিতা করেছিল? আর যখন তার নিজের অহংবোধ ও সত্যের মধ্যে একটিকে বাছাই করতে হয়েছিল, তখন সে কোনটিকে বেছে নিয়েছিল?

একইভাবে, অন্য মানুষের সঙ্গে আচরণ করার সময় সে কি ন্যায়বিচার করেছিল নাকি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যায় করেছিল? সে কি আন্তরিকভাবে একজন ভালো ব্যক্তি ছিল যেমনটি তাকে বাইরে থেকে দেখা যায়? সে কি সত্যকে না কি অন্য কোনো কিছুকে সবার উপরে স্থান দিয়েছে?

একইভাবে, ক্ষমতায় এসে সে কি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল নাকি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিল? সম্পদশালী হয়ে অথবা দরিদ্র অবস্থায় সে কি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল নাকি তা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল? সামাজিক জীবনে যখন তাকে সম্মানের আসনে বসানো হয়েছিল তখন সে কেমন আচরণ করেছিল এবং যখন তাকে সাধারণ আসন দেওয়া হয়েছিল তখন সে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল? সে কি তার আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল,

নাকি তার আকাঙ্ক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল? পরকালে প্রত্যেক নরনারীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এই সংরক্ষিত নথির উপর ভিত্তি করেই হবে।

এই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে সীমিত সময়ের জন্য। এই সময়কাল শেষ হওয়ার পর এখানে জন্মগ্রহণকারী সমস্ত মানুষকে ইশ্বরের সামনে উপস্থিত করা হবে। দেবদূতদের কাছে সংরক্ষিত নথি অনুসারে ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবেন। সংরক্ষিত নথি অনুসারে যারা পৃথিবীতে মহৎ চরিত্রের জীবনযাপন করেছে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করেছে, এবং নিজেদেরকে স্বর্গে বসবাস করার উপযুক্ততার প্রমাণ দিয়েছে, তারাই স্বর্গের উদ্যানে বসবাসের জন্য নির্বাচিত হবে। আর যারা তাদের চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে তাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং জঞ্জালের স্তূপে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের জীবন কাটবে হতাশা ও অনুশোচনায়, এবং তারা কখনোই এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

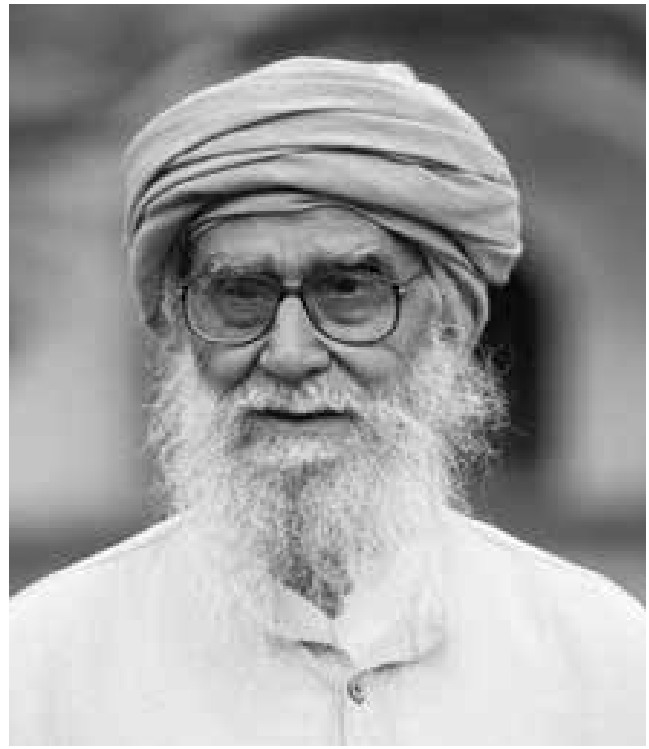

মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান (১৯২৫-২০২১) ছিলেন একজন ইসলামিক পণ্ডিত, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং শান্তির দূত, তাঁর কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে, মওলানা ২০০ টিরও বেশি বই লিখেছেন এবং ইসলামী ধারণার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রজ্ঞা এবং সমসাময়িক শৈলীতে কুরআন ও ইসলামের আধ্যাত্মিক অর্থের উপর হাজার হাজার বক্তৃতা রেকর্ড করেছেন। তাঁর কুরআনের ইংরেজি অনুবাদটি সহজ, স্পষ্ট এবং সমসাময়িক শৈলীতে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। তিনি শান্তির সংস্কৃতির প্রতি মানুষের মনকে পুনঃপ্রকৌশলী করতে এবং শান্তি, অহিংসা এবং আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করে ইসলামকে আধুনিক বাগধারায় উপস্থাপন করতে ২০০১ সালে সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালটি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা করেন।

mwkhan.com cpsglobal.org

# Quran Translations

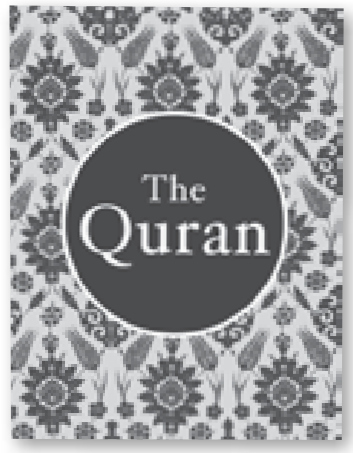


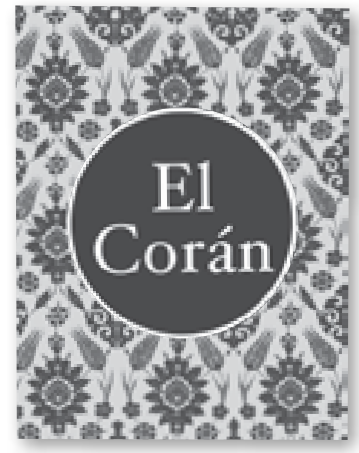


- English
- French
- Spanish
- German
- Dutch
- Italian
- Russian
- Portuguese
- Polish
- Japanese
- Korean
- Thai
- Chinese
- Ukranian
- Chichewa
- Filipino
- Hebrew
- Sinhalese
- Burmese
- Swahili
- Rwandese
- Czech
- Romanian
- Bengali
- Urdu
- Hindi
- Malayalam
- Tamil
- Marathi
- Telugu
- Gujarati
- Punjabi
- Kannada
- Dogri
- Assamese
- Manipuri

To order a printed copy of the Quran, please log on to: www.goodwordbooks.com, www.cpsglobal.org

To order Quran copies for hotels, hospitals and prisons please contact: info@goodwordbooks.com, info@cpsglobal.org
Mob: +91 8588822672

For requirements in the US and Canada, please contact: kkaleemuddin@gmail.com Mob. +1 617-960-7156

মানুষ একটি অবিনশ্বর জীব। তার জীবন দুটি পর্যায়ে বিভক্ত : মৃত্যু-পূর্ববর্তী জীবন এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবন। মৃত্যু-পূর্ববর্তী জীবন হল প্রস্তুতির সময়কাল এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবন হল কৃতকর্ম অনুসারে পুরস্কার গ্রহণের সময়কাল। অতএব, প্রতিটি পুরুষ ও নারীর এই সত্যটি বোঝা উচিত, কারণ এর উপরেই তাদের চিরন্তন ভবিষ্যত নির্ভর করছে।

goodwordbooks.com cpsglobal.org

Goodword Books CPS International centre for peace & spirituality PDF